তারিখ ...30 JUN 1995...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলের বিড়ম্বনা এড়ানো কি অসম্ভব

এ এন রাশেদা

অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল। অহেতুক বিড়ম্বনার শিকার যে কতসংখ্যক শিক্ষার্থী হবে তা ভবিতব্যই বলবে। তবে যাতে একজনও না হয় সেই কামনা করি। গত বছর যারা অযৌক্তিকভাবে এই অপমানের বোঝা মাথায় নিয়েছে তারাই বুঝতে পারছে এর যন্ত্রণা কত গভীর। শুধু গত বছরই বা বলা হবে কেন— প্রতিবছরই তা হচ্ছে। গত বছর এর মাত্রা ছিল অতিরিক্ত। এ প্রসঙ্গে ভিকারুন্নেসা স্কুলের কথা অনেকেরই হয়ত মনে আছে— সেখানে এক পরীক্ষার্থী মেধা তালিকা থেকে ১৩ নম্বর কম অর্থাৎ সর্বমোট ৮৭৩ পেয়েও ইংরেজি ১ম পত্রের রচনামূলক অংশে পেয়েছিল ০৩। একজন সর্বমোট ৭৫৩ পেয়ে ভূগোল রচনামূলক অংশে পেয়েছিল শূন্য। এমন হাজারও ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছিল শিক্ষার্থীরা। শুধু এসএসসিতে নয়, এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলও অনেক মেধাবীর অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। এমনকি উইথহেল্ড-এর তালিকা থেকে মেধা তালিকায় স্থান হয়েছিল।

বিড়ম্বনা আরও অনেক ধরনের আছে। আশানুরূপ নম্বর প্রাপ্তি না হলে তা যে শুধু পরীক্ষার্থীরই দোষ একথা আজকাল আর বলা যায় না। কেননা কিছু দুর্ঘটনা ঘটছে কম্পিউটারের কারণে, কিছু অন্য কারণে। এ রকম বহু ঘটনা অনবরত ঘটে চলেছে। দু' একটি উদাহরণ মাত্র দেয়া যেতে পারে। কিছুদিন পূর্বে এক শিক্ষাবর্ষে ভাল কলেজ নামে পরিচিত একটি কলেজের কিছু ছাত্র অংকে খুব খারাপ নম্বর পেয়েছিল— যার সাথে তাদের পূর্ব পরিচয় ছিল না। এর প্রতিকার চেয়েও তারা কোন ফল পায়নি। বোর্ড থেকে উত্তর— নম্বর বাড়েনি। মানসিক চাপের মাঝে বাড়ি থেকেও এইসব শিক্ষার্থী কোন সান্ত্বনা পায়নি। পেয়েছে নির্মম আচরণ— যা শুনে ব্যথিত হওয়া ছাড়া করার কিছুই ছিল না। স্বাভাবিকতাবেই অভিভাবকরা ভাবেন তাদের সন্তানরা নিশ্চয়ই খারাপ করেছে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটে তার সবই প্রকাশিত হয় না। শিক্ষা বোর্ড এদের সব আকাঙ্ক্ষাকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়— অথচ একবারও তাদের ভুল স্বীকার করে না। আর একটি ঘটনা : বেশ ক'বছর পূর্বে একবার ঐ কলেজেরই বেশকিছু ছাত্র গড়ে ইংরেজিতে খুবই কম নম্বর পেল। কারও জীবন থেকে এক বছর খসে গেল। বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রের কপালে দুর্যোগের ঘনঘটার ফলেই হয়ত কলেজ কর্তৃপক্ষ বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি সদয় হয়ে কলেজে সশরীরে তদারকিতে এসেছিলেন এবং কলেজে ধারণকৃত শিক্ষার্থীদের সারা বছরের রেকর্ড দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন ঢাকার খাতা ঢাকার বাইরে মূল্যায়নের জন্য আর যাবে না; 'কিন্তু তিনি ঐসব খাতা সঠিকভাবে পুনর্মূল্যায়ন করে ঐসব শিক্ষার্থীর জীবনকে গতিময় করতে পারেননি। 'কপালের লিখন' মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কি? তাই পরবর্তী বছর তারা সলজ্জভাবে পরীক্ষায় এসেছিল। এটা যে কোন সমাধান ছিল না তার প্রমাণ প্রতিবছরই মিলছে। এ বছরে ঐ কলেজেরই এইচএসসি'র প্রকাশিত ফলাফলে জীববিজ্ঞান ১ম পত্রের নম্বরপ্রাপ্তিতে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। বোর্ডে চ্যালেঞ্জ করে 'তথাস্তু' উত্তর। ৭৫ নম্বরের পরীক্ষায় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যেখানে ৬৫ থেকে ৬০ এর কম নয় সেখানে প্রাপ্তিযোগ ৩৫,৩৭ ইত্যাদি। তবে যেখানে 'কপাল' ছাড়া মেধা যাচাইয়ের সুযোগ আছে সেখানে তারা ঠিকই সুযোগ পেয়েছে— একজন বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজে মেধা তালিকার শীর্ষে অবস্থান নিয়ে বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছে, অন্যরা বুয়েট, মেডিক্যাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান করে নিয়েছে।

কম্পিউটারের কারণেই হোক বা অন্য যেকোন কারণেই হোক এসবের হাত থেকে আমরা কি আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচাতে পারি না? এসব নিয়ে কি ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই?

কেউ যদি ভেবেচিন্তে বলেন— যুগের দাবি যাকে অস্বীকার করে তা রাখার দরকারটাই বা কি? অনেকে হয়ত চিন্তিত হয়ে বলবেন, মাথাব্যথা হলে কি মাথা কেটে ফেলতে হবে? এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এন্ট্রান্স পরীক্ষা পরিচালনা করত অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে ১৯৫০ সালে কলকাতা বোর্ড গঠিত হয়। এখানে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। সেই সময় শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজকের তুলনায় কম ছিল; কিন্তু আজ তা তো চারটি বোর্ডেরও আয়ত্তের বাইরে। তাই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট কি নতুন ভাবনার দাবি করতে পারে না?

কথায় কথায় আজকাল অনেকেই ইউরোপ আমেরিকার উদাহরণ দেন। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সেই সব দেশের উদাহরণ টানতে খুব বেশি দেখা যায় না। আমেরিকায়— সেখানে ভিন্ন ভিন্ন স্টেটে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও আমাদের মত লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার রেওয়াজ চালু নেই। এলাকাভিত্তিতে শিশুরা যেমন পড়ার সুযোগ পায় (অর্থাৎ এক এলাকার শিশু অন্য এলাকায় যেতে পারে না) তেমনি ১২ ক্লাস পর্যন্ত পাসের সার্টিফিকেট স্কুলই দেয়, যদিও ক্ষেত্র-বিশেষে কিছুটা ভিন্নতা থাকতে পারে। ইংল্যান্ড বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের দিকেও আমরা তাকাতে পারি। এসব দেশে পরীক্ষা চলাকালে বহিষ্কার, পুলিশ, টিয়ার গ্যাস বা গুলি খরচের প্রয়োজন হয় না। ফলাফলের জন্য বছরের অর্ধেক সময় বসে থাকার বা পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে গাড়ি ভাঙচুরের প্রয়োজন পড়ে না। তাই এমন করে আমরাও তো ভাবতে পারি। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর ফলাফলের দায়িত্ব এক জায়গায় কুক্ষিগত না রেখে স্কুলভিত্তিতে বা একটি এলাকাভিত্তিতে যদি ভাগ করা যেত তাহলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ক্রন্দন তো বন্ধ করা যেত। এমন পরিকল্পনা এক ধাপেই যে সাধিত হবে— তা হয়ত নয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তো হতে পারে।

এ ব্যবস্থায় যেতে চাইলে প্রথমেই মেধা তালিকার সিস্টেম পরিত্যাগ করে গ্রেডিং সিস্টেমে যেতে হবে। যেখানে খাতার মূল্যায়ন বিভিন্নজনের দ্বারা বিভিন্ন রকমের হয় সেখানে কেউ কি হলফ করে বলতে পারবেন— মেধা তালিকার শীর্ষস্থান অধিকারী শিক্ষার্থীটি সেরা মেধাবী? তাহলে আর এ প্রহসন কেন? তার চাইতে বর্তমানে মুখস্থ বিদ্যার জোরে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে তার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর নিজস্ব মেধা কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীকে নিজের শক্তিতে লিখতে ও বলতে পারার উপযোগী করে গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে। স্কুলের ওপর যদি এই সার্টিফিকেট দেয়ার দায়িত্ব পড়ে তাহলে স্কুলও যত্নবান হবে তাদের শিক্ষার্থীদের সেভাবে পরবর্তী ধাপে যাওয়ার উপযোগী করে গড়ে তুলবার জন্যে। শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার ফি বাবদ যে পরিমাণ অর্থ শিক্ষার্থীদের জমা দিতে হয় তার চাইতে কিছু কম পরিমাণ অর্থ পরীক্ষার ফি হিসেবে নির্ধারিত হলে এবং স্কুলেই তা জমা হলে শিক্ষার্থী যেমন উপকৃত হবে প্রতিষ্ঠানও উপকৃত হবে। বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের কারণে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে, ফলে প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। শিক্ষকদের বোর্ড অফিসে ধরনা দিয়ে খাতা আনতে সময় অপচয় হয়— এ রকম নানাভাবেই এমনকি গুলি ও পুলিশের ও অপচয় হয়— যা আমাদের গরিব দেশের জন্য কাম্য নয়।

কেউ হয়ত বলবেন উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় তো লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে তখন কি হবে? আসলে কি তাই? উচ্চতরে তো নানা বিভাজন। কাজেই সেখানে চাপ কমবে। তাছাড়া ভিড় এড়িয়ে প্রকৃত মেধাবীদের নেয়ার জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব পন্থা তো নিতেই পারে। আবার স্কুলও বাছাই করে দিতে পারে তাদের শিক্ষার্থী কোথায় পড়ার উপযুক্ত বা কোথায় ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার যোগ্য।

এই ধরনের পদক্ষেপের কথা ভাবতে অনেকেই ভয় পেতে পারেন— তা খুবই স্বাভাবিক। কেউ বলতে পারেন সব প্রতিষ্ঠানেই তো আর ভাল শিক্ষকমন্ডলী নেই, কাজেই সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে। এখনও সে প্রশ্নের মীমাংসা নেই। কারণ যেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমন্ডলীকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে তারা তো বোর্ড পরীক্ষার খাতা দেখছেন। অন্যের খাতা দেখলে যদি অবমূল্যায়ন না হয় তবে শুধু নিজের প্রতিষ্ঠানের কাজেই কি তা অবমূল্যায়িত হবে? বরঞ্চ যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সেই প্রতিষ্ঠানের খাতা যদি তিনি সুঠিকভাবে মূল্যায়ন না করেন তবে খুব দ্রুত তা ধরা পড়বে এবং প্রতিষ্ঠান সেই শিক্ষককে সেভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে খাতাগুলো দ্বিতীয় শিক্ষকের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই চালু করতে পারেন, যেমনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। নিজেদের তত্ত্বাবধানে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর বেলায় যত দ্রুত এই কাজগুলো সমাধান করা সম্ভব বোর্ডের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। তাছাড়াও তো বোর্ডের রয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা, বোর্ড পরীক্ষাতেও চলে বাড়ি থেকে খাতা লিখিয়ে এনে জমা দেয়ার ঘটনা। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যখন সার্টিফিকেট দেবে— তখন প্রতিষ্ঠানের বলার অবকাশ থাকবে না যে, "কে তোমাকে মূল্যায়ন করেছে তা আমাদের জানা নেই।" কাজেই শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে। শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠতে যা সাহায্য করবে। শিক্ষার্থী বুঝবে সার্টিফিকেট গাছের ফল নয়— পেড়ে হাতে নিলেই তা নিজের হয়ে যাবে, (যদিও অন্যের গাছের ফল নিজের হয় না), ব্যাপারটি হচ্ছে অর্জন করবার। শিক্ষার্থীকে অর্জন করতে হবে— সামনের ধাপে পা বাড়াবার জন্যে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলবার চিন্তা ছাড়া আমরা যেমন শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব না তেমনি নকলপ্রবণতা রোধ বা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিরোধ করতে পারব না।

প্রশ্ন আসতে পারে প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি কিভাবে রোধ হবে? উত্তরে বলা যায়— শিক্ষার পরিবেশই তা করবে। এক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা যেমন বাড়াতে হবে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের সম্পৃক্ততাও বাড়াতে হবে। অভিভাবক ফোরাম গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করাও যেতে পারে। তার পরেও যদি প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের সুযোগ থেকে যায়— ক্ষুদ্র গন্ডিতে তা উন্মোচিত হবার সম্ভাবনা তো রয়েই গেল— কাজেই তার প্রতিকারও দীর্ঘমেয়াদী না হয়ে বরং সহজতর হবে।

যদিও শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর অবস্থায় নিয়ে যাবার প্রশ্নে অনেক শর্ত জড়িত— যেমন সমাজে শিক্ষকের সম্মান প্রতিষ্ঠাকল্পে পেশাকে আর্থিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় করা, পেশাগত মান উন্নয়নের ক্রমাগত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষার উপকরণ, পরিবেশ ইত্যাদি,— তাই বলা যায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবলে এবং সমাজের মানুষকে সম্পৃক্ত করলে তাও উন্নত হতে বাধ্য। শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত ফলাফলের বিড়ম্বনা থেকে আমরা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে পারব। সদিচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব। আর এর জন্য চাই শিক্ষকদের তরফ থেকেও শিক্ষার আন্দোলন।